সপ্তম অধ্যায়
চরিত্র সৃজনের বিশিষ্টতা

''এই প্রিয় পৃথিবীতে
চরিত্রের নির্মাণ ব্যাতীত সর্বজনীন কোনো শিল্প নেই
এই প্রিয় পৃথিবীতে
যা কিছু সুন্দর তার কাছাকাছি যাওয়া
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো পদযাত্রা নেই।
মলিন আঁধার ভেঙে এসো
মুঠোয় অনন্ত জ্যোৎস্না যেন খেলা করে।''[১]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীল রঙের ঘোড়া', 'গন্ধরাজের হাততালি', 'মৃত্যুসংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে আমরা একটি করে আগন্তুক চরিত্র লক্ষ করি। উদ্ভট তাদের আচার-আচরণ-কার্যকলাপ, বিচিত্র তাদের কথা-বার্তা— বাস্তবের মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে এদের উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। তিনি বলেছেন,—

> ''যে নাটকগুলো আমি লিখেছি, সেগুলোতে আমারই কিছু ভাবনাকে প্রকাশ করেছে— সে সমাজের কোনও সমস্যা নিয়ে হোক, বা মানুষের অন্য কোনও গূঢ় সমস্যা নিয়েই হোক— সে বিষয়গুলো তো আমারই ভাবা বিষয়। সেই ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করার জন্য আমি কতকগুলো Characters, situations কে আশ্রয় করেছি। ... আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলো কিন্তু reality-র মধ্যে, আপাত বাস্তবের মধ্যে যে চরিত্রগুলো বিচরণ করে, তাদের মতো নয়। আমার প্রধান চরিত্রগুলো দেখলে মনে হয় যে স্বাভাবিক নয়, যেন এমন দেখি না সচরাচর। আমি তো সেরকম একটা unreal Character কেই নিয়ে আসি। কাজেই it is queer mixture of these two elements— এটা একটা New chemistry..."[২]

কিন্তু তাঁর নাটকের একটি-দুটি উদ্ভট চরিত্র বাদ দিলে বাকি চরিত্রগুলোকে বাস্তবরূপেই উপস্থাপন করেছেন তিনি। তাদের আচরণ রিয়ালিজমের নিয়ম-কানুন মেনেই নিয়ন্ত্রিত। মোহিত চট্টোপাধ্যায় এক সময় খুব বিদেশী নাটক অধ্যয়ন করতেন। বেকেট, ইওনেস্কো, এডওয়ার্ড অলবি, ও'নীল, হ্যারল্ড পিন্টার এঁদের নাটকেও অবাস্তব, উদ্ভট, আগন্তুক চরিত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। যাদের কাণ্ড-কারখানা উল্টোপাল্টা মনে হয়। কিন্তু তাঁদের নাটকে প্রায় সব চরিত্রের আচরণই উদ্ভট বলে মনে হয়, সেখানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক শুধুমাত্র একটি করে চরিত্র নন রিয়ালিস্টিক মনে হয়। প্রথম দিকে তাঁর নাটক দর্শক ও সমালোচকরা ভালোভাবে নেননি। একবার শিবপুরে তাঁর 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি চলাকালীন দর্শকদের আক্রমণের মুখে পড়েছিল। সমালোচকেরাও অকথ্য ভাষায় উদ্ভট চরিত্রের কারণে তাঁর নাটককে

আক্রমণ করেছিল। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একটা চরিত্রই যেখানে নাটককে দর্শকের কাছ থেকে দূরত্ব তৈরি করে দেয়, সেখানে সব চরিত্রই উদ্ভট হলে বাংলায় তাঁকে আর নাটক করতে হত না।

ততদিনে তিনি কবিতা লেখাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই জন্য তাঁকে একটা আপস করতে হয়েছিল। আপসটার জন্য লেখক হিসেবে তাঁর কান্না পেত। কেননা তিনি যেটা চেয়েছিলেন সেটা পূরণ করতে পারেননি। পারার কথাও নয় কারণ বাংলা থিয়েটারের জগতে রিয়ালিজমের একটা পরিবেশ তখন তৈরি হয়েছে। রিয়ালিজম প্রবল প্রতাপ নিয়ে তখন প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, বাংলার নাট্যদর্শকের ননরিয়ালিজমের অনভ্যস্ততার মধ্যে তিনি সমস্যায় পড়তে পারেন। তখনকার পরিস্থিতিটাই ছিল সেরকম। তখন তিনি একটা বা দুটো চরিত্রের মধ্যে উদ্ভটতা আনতে চাইলেন যেগুলি নাটকের প্রধান চরিত্র ছিল। আর এর জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন এক্সপ্রেশনিজমের দ্বারা। তিনি শুধু ইউরোপ-আমেরিকার নাটকেরই একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন না, তাদের চিত্রকলার প্রতিও তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। তিনি তখন নিজের সাধ্যমতো বিদেশী চিত্র দেখতেন, নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করতেন। চিত্র শিল্পের দ্বারা তিনি অনেক কিছু শিখেছিলেন। কবিতা ও নাটক রচনা অনেক কিছু ভাবতে শিখিয়েছিল তাঁকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

> ‘‘এখানে আমার বনে-এর ছবি মনে পড়ে, বনে ছবি এঁকেছিলেন কতকগুলো স্ট্রোকে। পরপর অনেকগুলো একই স্ট্রোকের ছবি এঁকেছিলেন, দেখলে মনে হয় একটাই ছবি তিনি অনেকবার এঁকে গেছেন। কিন্তু তাঁর ছবিগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলে এবং বনে- এর ছবি আঁকার দর্শনকে স্মরণ রাখলে বোঝা যায়, যে তিনি বলতে চাইছেন বস্তুটা কিছু না, একটা পার্থক্য তৈরি করে, আর এট্রাকশন তৈরি করে লাইট। একটা লাইট যখন চেঞ্জ করছে সঙ্গে সঙ্গে সাবজেক্টটাও পাল্টে যাচ্ছে। একজন ছবি আঁকিয়ে শিল্পীর কাছে ওই লাইটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমায় নাটকটা লিখতে খুব সাহায্য করেছিল। যেমন গল্পের আট দশটা মানুষ খুব স্বাভাবিক ছিল। হঠাৎ একজন এল আগন্তুকের মত এবং সে অন্য কথা বললো। অন্য সমস্যা আনলো, তার অন্য প্রকাশ ভঙ্গি হলো। আর এই অন্য আলোতে আগের মানুষগুলো চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা নতুনভাবে ভাবতে চেষ্টা করলো। তাদের অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন এলো।’’[৩]

তিনি ভেবেছিলেন এটাই অনেক, যেহেতু সব চরিত্রগুলোকে ননরিয়ালিস্টিক ধাঁচের করলে দর্শক নিতে পারবে না, তাই একটি চরিত্রের প্রভাবই তিনি দেখাতে চাইলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, যখন আমাদের একঘেয়ে অভ্যস্ত জীবনে নতুন কোন সত্য এসে পড়ে তখন আমরা কিছুটা আলোকিত হই, আলোড়িত হই। আর এটাই তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। তিনি বনে-এর ছবির মতো দেখাতে চেয়েছিলেন, একটা নতুন লাইটের কতটা ক্ষমতা, পরিচিত মানুষদের মাঝে একটা অপরিচিত মানুষ চলে এলে কী ঘটতে পারে। একটা নতুন পথ খুলে দিতে পারে, একটা নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম দিতে পারে— যেটা তিনি তাঁর নাটকে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’, ‘মৃত্যুসংবাদ’ নাটকে একটি করে আগন্তুক

চরিত্র রয়েছে। তাঁদের আচরণেই শুধু উদ্ভটত্ব আছে, তাদের বাদ দিলে বাকি চরিত্রগুলোর চলন, কথন, ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। আগন্তুক চরিত্রগুলোর আবির্ভাব নতুন আলোর মতো যারা চেনা পৃথিবীর অচেনা আলো নিয়ে আসে, অচেনা কথা-চিন্তা-অভ্যাস নিয়ে আসে, যাদের প্রভাবে বাকি চরিত্রগুলোর পরিচিত বোধ বদলে যেতে থাকে, তাদের প্রভাবিত করতে থাকে। তারাও আলোকিত হয়, আলোড়িত হয়, নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়, অচেনা মানুষগুলো নতুন দিক উন্মোচন করতে থাকে তাদের সামনে। তিনি কখনও আবার দুটো বা তিনটে চরিত্রকে একটু অবাস্তবের পথে পরিচালিত করেছেন। যেমন তাঁর 'ঢিসুম ঢিসুম' নাটকটিতে তিনটে চরিত্র রয়েছে। পরে আবার তিনি তাদের বাস্তব জগতেই এনে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি তাঁর নাটকে একজন চরিত্রকে অবাস্তব করেছেন বাকিদের বাস্তবোচিত করেছেন। নাটকীয় বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য যেটা তাঁর চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। তিনি চেয়েছিলেন—

> ''মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে সব চরিত্রগুলোকেই যদি ওই জায়গা থেকে মানে অবাস্তবতার মধ্যে দিয়ে আনি? প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরের জগৎটা নিয়ে নাটক করার খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু পেরে উঠি না। ইচ্ছে করে ছোট কোন নাটকের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করার। সেটা পড়ার মত করে ছাপলেও কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু বয়স অনেক বেশি হয়ে গেছে তাই কাজ করার ক্ষমতার উপর একটা সংশয় আছে।''[৪]

তিনি সবসময় মানুষের অন্তর্গত দিকটা উন্মোচন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> ''যে মানুষটাকে আমি মনে করি খাঁটি, যার ভেতর প্রতিহিংসা নেই, যে মানুষটা সৎ, যেখানে তার মুখোস পরার বা কোনও কথা বানিয়ে বলবার দরকার পড়ে না, যেখানে তার মনের সৎ অসৎ বাসনাগুলো বলার কোন অসুবিধে নেই।''[৫]

তার অন্তর জগতের কথা কেবল তিনিই শুনতে পান। বাইরের মানুষটা সমাজ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জীবন-যাপন করলেও ভিতরের মানুষটা এসবের তোয়াক্কা করে না। নিয়ম বিরুদ্ধ বল্গাহীন ভিতরের মানুষটিই একমাত্র খাঁটি। এই খাঁটি মানুষটিকেই তিনি সবসময় দেখাতে চান। শুধু বাইরের মানুষটাকে দেখলে ঠকতে হয়। বাইরের আর ভিতরের মানুষ মিলে একটা সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁর নাটকে এই সম্পূর্ণ মানুষই এসেছে, অর্দ্ধেক মানুষ নয়। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ভালোবাসার ন্যায়নীতির কথা বললেও তিনি কখনো মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কথা বলেননি। প্রত্যেকের মধ্যেই যৌনপ্রবৃত্তি রয়েছে, তিনি যে ভিতরের মানুষের কথা বলেছেন তার মধ্যেও আছে। কিন্তু তিনি সেটা দেখান না। তিনি বলেছেন—

> ''তাহলে কী আমি সেনসার করে বলি? অর্থাৎ আমি যে ভেতরের মানুষটাকে আনি তাকে যথেষ্ট সেনসর করেই আনছি ...''[৬]

তাঁর 'মিস্টার রাইট' নাটকে তার প্রমাণ রয়েছে। মিস্টার রাইটের মধ্যে যে কামনা-বাসনার অস্তিত্ব, সেটা ছিল কালো এবং সাদায়, ডা. ডিকসন ও মিস্টার রাইটের লড়াইটা তিনি অনেক মার্জিতভাবে দেখিয়েছেন।

সাহসী হতে তিনি পারতেন কিন্তু সমাজ-পরিপার্শ্বিকতাটাও তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন এবং একটু একটু করে এগোতে চাইছিলেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তব বিরোধী বা অন্তর্বাস্তব কেন্দ্রিক চরিত্র সৃষ্টির কারণগুলি হল—

প্রথমত: মোহিত চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন, রিয়ালিজম চায় ঘন বাস্তবতার মধ্যে জীবনের কল্পনাকে পুনর্জীবিত করতে, যা বহির্বাস্তবের প্রকাশকে মেনে চলে। কিন্তু একজন শিল্পী শুধুমাত্র বাহ্যিক বা উপরি বাস্তবের চিত্রায়ণ দ্বারাই সন্তুষ্ট হন না। বহির্বাস্তবের ভান, সীমাবদ্ধতায় সে অসন্তুষ্ট হয়। তার স্বপ্নের অন্তর্দৃষ্টি, অন্ধকার, উদ্ভটতা প্রকাশ পেতে চায়। তখন শিল্পস্রষ্টা বাস্তবতার সীমান্ত পরিবেশের মধ্যে আর থাকতে চায় না।

দ্বিতীয়ত: তখন তিনি রিয়ালিজমকে ভাঙতে চান। রিয়ালিজম ও নন-রিয়ালিজমের নিয়মকানুনকে আয়ত্ত করে, তার মধ্যে থেকে নিজেকে প্রকাশ করতে চান— অনেকটা বিমূর্তরূপে। এই কারণে পাশ্চাত্যেও নানা সাহিত্য, শিল্প, চিত্র, দর্শনের জন্ম হয়, যেমন এক্সপ্রেশনিজম, প্রতীকবাদ, ফিউচারিজম, কিউবিজম। এছাড়া বাস্তবতার মধ্যে থেকেই তারা বাস্তবতার মধ্যে অনেক কিছু নতুন যুক্ত করেছেন যেমন— ম্যাজিক রিয়ালিজম, মাইরেজ রিয়ালিজম, আল্ট্রা রিয়ালিজম, ডার্ক রিয়ালিজম।

তৃতীয়ত: মানুষের জীবন কোন নির্দিষ্ট একটা ছকে বাঁধা যায় না। তার জীবনে বহু স্তর ও মাত্রা রয়েছে। বহুমাত্রা ও বহুস্তর নিয়েই মানুষের সম্পূর্ণতা। বরফের টুকরো জলে রাখলে যেমন ভেসে ওঠে। তার অর্ধেক অংশ জলের তলায় এবং অর্ধেক অংশ বাইরে থেকে দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। বাইরে থেকে মানুষের অর্ধেক অংশ দেখা যায়। কিন্তু ভেতরের বেশিরভাগ অংশই থাকে অদেখা, অসম্পূর্ণ। তাই এই দুইয়ে মিলে মানুষের যে সম্পূর্ণ অংশ— সেটাকে তুলে ধরাই একজন শিল্পস্রষ্টার কর্তব্য। কেননা জীবনের সম্পূর্ণ সত্যকে, প্রকৃত বাস্তবকে না দেখালে কোথাও যেন ফাঁকি থেকে যায়। তিনি বলেছেন—

> ''এই মানুষটাই real, এই মানুষটাই সত্য। Non-realistic art এই গোটা মানুষটাকে, এই প্রকৃত 'সত্য'কেই ধরতে চায়। Realism-ও এই সত্যকে জানতে চায়, কিন্তু surface reality বা mimetic reality-র প্রতি এই শিল্পধারার আনুগত্য অত্যন্ত বেশি বলেই Non-realistic শিল্প কর্মের মতো মানুষের বহুমাত্রিকতা প্রকাশ করতে অক্ষম হয়।''[৭]

চতুর্থত: মানুষের আইডেন্টিটি অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের, তাকে আবিষ্কার করা খুব কঠিন কাজ। একই মানুষের ভেতরের আর বাইরেরটা আলাদা—

> ''আসলে এই ভেতরের মানুষটাও একজন নয়, সে বহুরূপী, তার কোনও fixed indentity নেই। কেউ যখন তার ছোট্ট ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে সে মানুষটি তখন বাবা, ওই একই মানুষ যখন তার বাবার মুখোমুখি হন তখন তিনি সন্তান। পিতৃত্ব থেকে তার সমগ্রসত্তা তখন সন্তানের সত্তায় রূপান্তরিত হয়। এই ব্যক্তি আবার যখন তার স্ত্রীর কাছে আসেন তিনি রূপান্তরিত হন স্বামীর চরিত্রে।''[৮]

এইভাবে একটি মানুষ যখন অন্য মানুষের সঙ্গে বা নানা ঘটনার সামনাসামনি হয়, তার প্রতিক্রিয়ায় ভিতরের ও বাইরের মানুষটি অজস্র চরিত্র রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। মানুষের আইডেন্টিটি নির্ভর করে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ওপর। আমাদের কোনও নির্দিষ্ট আইডেন্টিটি নেই। ক্রমাগত প্রতিক্রিয়ার ফলেই মানুষের বহুমাত্রিক বহুরূপী জীবনের জন্ম হয়।

পঞ্চমত, আমাদের যেমন নির্দিষ্ট আইডেন্টিটি নেই, তেমনি আমরা নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকি না। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিনটে কালের মধ্যে আমরা সর্বদা মানসিকভাবে যাতায়াত করি। এলোমেলো সময় এবং স্থানের মধ্যে মানসিক যাতায়াতই জীবন। তিনি বলেছেন—

> ''Non-realistic শিল্পকর্মে স্থানকালের এই অস্থিরতা, ভ্রাম্যমানতা এবং juxtaposition বিশেষ গুরুত্ব পায়। Realisitic শিল্পকর্মে বিশেষ একটি tense প্রাধান্য পায়, অন্য tense মাঝে মধ্যে flash back বা flash forward-এ আসে কাহিনী বা ঘটনার কৃত্রিম রূপায়ণে।''[৯]

মানুষের কোন নির্দিষ্ট পরিচিতি নেই এবং মানুষ কোনও নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের মধ্যেও মানসিকভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকে না, এটা সত্য এবং বাস্তব। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়—

> "realism যতটা না এই real-এর কাছাকাছি তার চেয়ে Non-realism ঢের বেশি কাছাকাছি। তাই Paradoxically বলা যায়, Non-realism is more realistic than realism."[১০]

ষষ্ঠত, একটি মানুষ বিভিন্ন চরিত্রের সমাহার। একটি মানুষের মধ্যে দুটি মানুষ। বাইরের এবং ভিতরের দুটি মানুষের রসায়নেই একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়। মানুষের দ্বৈত অস্তিত্বকে যখন নাটকের চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করা হয়, তখন উদ্ভট, অবাস্তব এবং হাস্যকর বলে মনে হয় সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু নাটকে তাদের এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে যাতে, এই উদ্ভট চরিত্রটা কেউ বাতিলও করতে পারবে না। কারণ, ''সে চলতে চলতে এমন কতগুলো মহাসত্যকে, ট্রুথকে প্রকাশ করছে জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে, তখন মনে হবে এইভাবে না বললে সত্যকে তেমনভাবে পেতাম না। ... এই মানুষই কিন্তু রিয়ালিস্টিক মানুষ— ভেতর এবং বাইরেরটা মিলিয়ে যে মানুষ সেটাই বাস্তব মানুষ— সে আমি আপনি সকলেই।''[১১] তিনি বলেছেন—

> ''In seek for the bridge which leads from the visible to the invisible to discover the magic of inner reality or the truth." তাই এ ধরনের নাটকে থাকে Shadows of reality ... the unreality of reality.''[১২]

সপ্তমত, শিল্পের এই নন রিয়ালিস্টিক অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারাই মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর নাটকও এই ধারাতেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি গভীর ও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন বাইরের মানুষটা যে রকম ভিতরে সে সবসময়ে সমান নয়। বাইরের মানুষটার সঙ্গে

ভিতরের মানুষটার বহু পার্থক্য রয়েছে—

> ''বাইরে যে ছন্দোবদ্ধ, ভিতরে সে হয়তো ছন্নছাড়া; বাইরে যে হিসেবি, ভিতরে সে হয়তো উদ্ভ্রান্ত। ভিতরের মানুষটির কত বিচিত্র খেয়াল, কত বিচিত্র তার চালচলন, কত অদ্ভুত তার কাণ্ডকারখানা। Realistic নাটকে এই ভিতরের ভিন্ন স্বভাবের অদ্ভুত মানুষটি আমল পায় না, তার বহির্জগতের জীবনটা নিয়েই প্রধানত তার কারবার।''[১৩]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের নাটকে উদ্ভট, আউটসাইডার, ভবঘুরে, আগন্তুক চরিত্রদের দেখা যায়। আমাদের দেশের স্বাধীনতার সময় দেশভাগকে কেন্দ্র করে যে উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি করে— তা এককথায় ছিল ভয়াবহ। সমকালীন সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্রে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ভবঘুরে, গৃহচ্যুত, আশ্রয়হারা, স্বদেশ-চ্যুত মানুষদের সর্বত্র দেখা যায়। তাদের নিজের কোন পরিচয় নেই, সংসার নেই, পরিবার- আত্মীয়স্বজন নেই। সেই সময়ের ইউরোপীয় সাহিত্য-শিল্প-নাটক-চলচ্চিত্রে তার চিহ্ন থেকে যায়। বিপন্ন বিধ্বস্ত সময়ের প্রতীক হয়ে উঠে এই মানুষগুলো। বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''যেহেতু এই টানগুলো এদের নেই, জোড়ে বাঁধা সুতোগুলো এদের নেই, সেগুলো সময় ছিঁড়ে দিয়েছে, ইতিহাস ছিঁড়ে দিয়েছে। এরা বাইরে থেকে হঠাৎ চলে আসে, সমাজের মধ্যে, সংসারের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন তুলতে থাকে। খুব মৌলিক প্রশ্ন, অস্তিত্বের প্রশ্ন। ... মোহিত যখন তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলি লেখেন যেখানে সেই ভবঘুরে, বহিরাগত, বহির্বাসিত চরিত্রগুলো আছে। একটা অবস্থান— একটা মনোভঙ্গীর দ্যোতক হয়ে ওঠে, সময় যখন পাল্টে যায়, তখন শুধু একটা সময়— একটা বোধ, একটা দেশকে হারানো নয়, তখন আমাদের চারপাশে অন্য একটা আবেগ, একটা এলিয়েন দেশ, একটা পরবাসী দেশ।''[১৪]

এই বিচ্ছিন্ন দেশরই সব চেয়ে প্রভাব লক্ষ করা যায় মোহিত চেট্টোপাধ্যায়ের নাটকে।

এছাড়া মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের বহিরাগত বা আউটসাইডার ও আগন্তুক চরিত্রগুলো নির্মাণের পিছনে অ্যাবসার্ড দর্শন ও নাটকের প্রভাব রয়েছে। শূন্যতা, অস্তিত্বহীনতা, নাথিংনেস ও লস্টনেস আচ্ছন্ন অজ্ঞাত ও উদ্ভট চরিত্রগুলো অস্তিত্ব সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন করে। অ্যাবসার্ডবোধ তাড়িত হয়ে তারা বহির্বিশ্বের সমস্ত কিছু থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে থাকে। আত্মীয়-পরিজন ও মানুষের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, অতীত মনে করতে পারে না, অস্তিত্বের বিপন্নতায় তাদের বর্তমান যন্ত্রণাদীর্ণ, ভবিষ্যৎটাও অন্ধকার মনে হয়, কোথাও কোন আলোর ঠিকানা না পেয়ে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চরিত্রগুলো নিজেদের সাজাপ্রাপ্ত নির্বাসিত অপরাধী ভাবতে শুরু করে। বাইরের সমস্ত কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে যদি চারদিকটা অচেনা, অপরিচিত মনে হয়— তবে তো বাকি পৃথিবীর কাছেও সে একজন আগন্তুক বা Outsider।

সমালোচকের মতে তিনি কবিতা থেকে নাটক জীবনে প্রবেশ করেছেন এই বিচ্ছিন্ন, পরবাসী,

এলিয়েন দেশের নাটকের চরিত্রগুলোকে উপস্থাপনের জন্যে। তাঁর নাটকে আগন্তুক চরিত্রদের যে ব্যথা, বেদনা, বিপন্নতা, সংকট, অস্তিত্বের জিজ্ঞাসার কথা আছে তা কখনোই কবিতার মাধ্যমে বলা সম্ভব ছিল না। নাটকের মাধ্যমে নানা চরিত্রদের ব্যক্তিগত উচ্চারণের মাধ্যমে তা বলা সম্ভব। কবিতা যেভাবেই, যত উচ্চ কণ্ঠ, সংলাপের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হোক না কেন তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। কবিতায় ভাবের কথা, আত্মগত উপলব্ধির কথা নানা চরিত্রদের চিন্তা ভাবনার দ্বন্দ্ব, অ্যাকশনের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। কবিতায় গভীরতা সম্ভব, কিন্তু নানা ভাব ও ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই গভীরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কবিতায় কবির কথা পাঠক পাঠ করেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''... কবিতার সঙ্গে একজন পাঠকের সম্পর্ক একটা সময়ে তার চেয়ে বেশি নয়। অনেক গভীরে যেতে পারে কবিতা— যখন আপনি একা পড়ছেন তখনই। সেটার একটা সিদ্ধি আছে, সেটার একটা লক্ষ্য আছে। কিন্তু ষাটের দশকে সময়টা অনেক সংকটময়। শুধু কবিতায় বিবেক ভরে না মোহিতের, সেই জন্য তিনি থিয়েটারে আসেন এবং তার থিয়েটার প্রথম থেকেই দৃশ্য, দৃশ্য সাজানো। দৃশ্যকে যেভাবে তিনি বর্ণনা করেন, তার ছবিটা তিনি সেভাবে তৈরি করেন এবং তিনি চান— শোনা নয়, এই ছবিটা আমরা চাক্ষুস দেখব। দীর্ঘ মঞ্চনির্দেশ থাকে। বারবার পাল্টায় মঞ্চনির্দেশ, আলো পাল্টায়, নানা বস্তু পাল্টায়। পরিবেশের উপর কতটা জোর দেন এবং একটা সম্মোহন পরিবেশ তৈরি করেন যার মধ্যে একা মানুষ যখন প্রবেশ করে তার ওই সত্ত্বাটা নাড়া খায়। বেরিয়ে আসে ওই পরিবেশের ছন্নছাড়া চেহারায়।''[১৫]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকের চরিত্র নির্মাণে এক্সপ্রেশনিস্ট নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। J.L. Styan তাঁর 'Modern drama in theory and practice (volume3)' গ্রন্থে এক্সপ্রেশনিস্ট নাটকের চরিত্র নির্মাণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন—

> "Characters lost their individuality and were merely indentified by nameless designations, like 'the man', 'The Father', 'The son', 'The workman', 'The Engineer', and soon. Such characters were sterotypes and caricatures rather than individual personalities, and represented social groups rather than particular people. In their impersonality, they could appear grotesque and unreal, and the mask was reintroduced to the stage as a 'primary symbol' of the theatre: It is unchangable inescapable:"[১৬]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনেক নাটকে চরিত্রদের কোন নাম নেই। যেমন, 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে 'একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক, 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকে 'একজন প্রৌঢ়', 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকে 'আগন্তুক লোকটি', 'নিষাদ' নাটকে 'প্রথম সাংবাদিক', 'দ্বিতীয় সাংবাদিক', 'প্রৌঢ়', 'প্রথম তরুণ', 'দ্বিতীয়

তরুণ', 'তৃতীয় তরুণ', 'ম্যাজিসিয়ান', 'প্রভু', 'বাঘবন্দী' নাটকে 'যুবক', 'লোকটি', 'বিচারক', 'রাজরক্ত' নাটকে 'প্রথম', 'দ্বিতীয়', 'ছেলেটি', 'মেয়েটি', ' রিঙ', নাটকে 'ডাক্তার'। নামহীন এই চরিত্রগুলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা হারিয়ে পরিচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতীকী নামে। ব্যক্তিগত মানুষের পরিবর্তে সমাজ-রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতীকে এরা উপস্থাপিত। কখনো অদ্ভুত ও অবাস্তব রূপে, কখনো বাস্তব, পরাবাস্তব, স্বপ্নবাস্তবের মিলনে উদ্ভট ও আশ্চর্য রূপে নাট্যকার এদের নির্মাণ করেছেন অসামান্য দক্ষতায়।

তাঁর নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল একই চরিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে রূপান্তর। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রিজিৎ' নাটকেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। 'নিষাদ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দিবাকর পার্কে একজন যুবতীকে পার্স খুঁজতে দেখে। দিবাকর তার সঙ্গে একটু আলাপ করার পর হঠাৎই তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় সাংসারিক মানুষ হিসেবে দেখা যায়। 'রাজরক্ত' নাটকে চরিত্রদের কোন নাম নেই। 'প্রথম', 'দ্বিতীয়', 'ছেলেটি' ও 'মেয়েটি' রয়েছে। কিন্তু এদেরই নানা ভূমিকায় দেখা যায়। প্রথম ব্যক্তিকে রাজা সাহেব, রাজাসাহেবকে আবার কখনো শিক্ষক রূপে, ব্যবসায়ী মালিক রূপে, ফেরিওয়ালা রূপে, রক্ষী রূপে, বাবা রূপে, সংবাদপত্রের অফিসের মালিক রূপে, চিকিৎসক রূপে, মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য রূপে এবং সবশেষে বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহে সামিল হতে দেখা যায়।

তাঁর নাটকের নায়ক চরিত্রগুলো 'ভালোবাসার কাঙাল'। অন্যান্য সমস্ত কিছুর মতো তাদের ভালোবাসাও অদ্ভুত ধরনের। কাউকে না দেখেই দীর্ঘদিন ধরে তাদের মনে ভালোবাসা জমতে থাকে। তারপর কাউকে ভালো লাগলে দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সারসংক্ষেপ অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করে। ভালোবাসা সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের ভাবনা তাদের। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে সমীর ভালোবাসার মানুষের কথায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে। ভালোবাসার জন্য 'মেরুদণ্ড খুলে ফেলে ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, আরশোলা' হতে তার আপত্তি নেই। 'ভালোবাসা যদি চায় সমস্ত ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ পোঁটলা করে মাথায় তুলে খালি গায়ে এসপ্লানেডের মোড়ে খড়ম পরে নৃত্য পর্যন্ত করে যেতে' চায় সে। নির্জন রাস্তার শেষ ল্যাম্পপোস্টটার উপর যেমন একটা পাখি এসে বসে সেরকম করে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেতে চায় সে। 'অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি' মনে করেন 'ভালোবাসা যেহেতু সকলেরই নিতান্ত দরকার, তাই ভালোবাসা চাল, ডালের মতো দোকানে থাকলে ভালো হতো। কিংবা জলের কলের মতো ঘোরালেই বালতি ভর্তি করে নিতে পারলে সুবিধা হতো।' ভালোবাসা থেকেই লোকসানের পরিণতি পৃথিবীতে সব থেকে বেশি', তাই 'কণ্ঠনালীতে সূর্যে'র নায়ক ভালোবাসার জন্য এন্ট্রি ফি চালু করার পক্ষপাতী।

'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকের চঞ্চল 'একটু প্রেম করার জন্য ছেলেদের ম্যাজিক, ভোজবিদ্যা, যাদু খেলা' শেখে। ভালোবাসার মানুষকে একটু দেখার জন্য টাকা খরচা করে। প্রেমিকার সামনে নিজেকে '... সরল, নির্ভেজাল, নো দালদা বিজনেস সেন্ট পার্সেন্ট লাভার, খাঁটি মানুষ' হিসেবে ঘোষণা করে। মিনুরা হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়ায় চঞ্চল ভয় পায় তার অভাবের জীবনে মিনুর ভালোবাসার মনটা হয়তো বেশিদিন বাঁচবেনা। সমস্ত পৃথিবীতে চঞ্চল কখনো সুখ দেখেনি, আলো দেখেনি, ঐশ্বর্য দেখেনি। তাই

মিনু ছাড়া তার আর কেউ নেই। মিনু একটু নড়ে উঠলেই চঞ্চলের ভিতর ভূমিকম্পের ভয় হয়।

'মৃত্যুসংবাদ' নাটকের আগন্তুক লোকটি বুলুর 'মুখের ওপর দিয়ে, চোখের মণির মধ্য দিয়ে, প্রজাপতি উড়ে যেতে' দেখেন। বুলুকে কাছে পেয়ে লোকটি বলেন,—

> ''লোকটি।। ... আমি কোন ভালোবাসা পাইনি, অথচ ওই ভালোবাসা ভীষণ দরকার আমাদের, ভীষণ দরকার আমাদের, ভীষণ—। একটি মনের মতো মেয়ে অনেক পারে জানেন, অনেক পারে।''[১৭]

ভালোবাসার মানুষকে ছুঁয়ে থাকলে তার 'বাজে চেহারাটা দেব-বালকের মতো' হয়ে যাবে। 'গলার স্বর চমৎকার, গায়ের ময়লা জামাকাপড় স্বর্গের উজ্জ্বল পোশাকে ঝলমল করে উঠবে।' ভালোবাসার প্রসন্নতায় মন যেখানে সেখানে ছিটিয়ে দিলে 'ফুলের বীজের মতো বাগান গড়ে দেবে।' ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে তিনি যাই দেখবেন সেখানে 'ঝাঁক ঝাঁক পাখি হয়ে যাবে।' ভালোবাসায় পূর্ণ শরীর আঙুল দিয়ে যা ছোঁবেন সেখানে 'ভোরের রোদ আর জ্যোৎস্নায় চিকচিক করে উঠবে'। নিজেকে তখন তিনি দারুণ একটা ম্যাজিকওয়ালা ভাবতে থাকবেন। এই নাটকে প্রেমের প্রকাশে ভাষা যেন সৌন্দর্যের শিখর ছুঁয়েছে।

'গন্ধরাজের হাততালি' নাটকে প্রতিবেশী অরুণ মীরার মুখে একটা 'আশ্চর্য অশ্রয় খুঁজে' পান। তার চোখে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান— 'একটি ছায়াভর্তি গাছ মাথার ওপর দুলে দুলে হাওয়া দিচ্ছে।' অচেনা, অজানা, উদ্ভট ধরনের মজাদার মানুষ হরিকিঙ্কর তলাপাত্র। তিনি রঙ ভালোবাসেন। রঙ নিয়ে মজাদার এক্সপেরিমেন্ট করেন। তিনি মীরা দেবীর মধ্যে একটা আকাশ আবিষ্কার করেন। একটা আকাশের 'বিদ্যুৎ', 'জ্যোৎস্না', 'নীল আভা', 'চোখের দৃষ্টির মতো নক্ষত্র', 'গুরু গুরু মেঘের ডাক' দেখতে পান এবং তাকে প্রেম নিবেদন করেন। মাঝবয়সী প্রণব মিত্র একবার শখ করে ফিটন গাড়িতে চেপেছিলেন। বিলাসের সেই রোমান্টিক মুহূর্তে তিনি মীরাকে দেখেছিলেন। তারপর থেকে মীরা তার মনে দাগ কেটেছিল। তারপর নানা কারণে দুজনেরই বিবাহ না হওয়ায় জীবনের মাঝ বয়সে এসে প্রণববাবু মীরাকে ভালোবাসা জানাতে এসেছেন।

'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে যে ভালোবাসা অভিবকদের, সমাজপতিদের পছন্দ নয়— সেই নিষিদ্ধ সম্পর্ক শান্তা ও প্রেতের মধ্যে তৈরি হয়। শান্তা একটা প্রেতকে 'একটু আশ্রয়', 'বিশ্বাস', 'সুখ', 'উদ্দীপনা' দিয়ে সমাজে আবার ফিরিয়ে আনতে চান। শান্তাকে পেয়ে প্রেতের মধ্যে খুশি আসে, মজা আসে, প্রাণ আসে। শান্তা প্রেতকে ভালোবাসায় বাঁচিয়ে দেন। প্রেত এখন ''শৈশবের স্বপ্ন নিয়ে খেলতে' চায়। শান্তার চোখে, মনে আলো খুঁজে পায় প্রেত। অন্ধকার থেকে এতোদিনে উদ্ধার পেয়ে সে শান্তাকে ছুঁয়ে দেখতে চায়।

'নিষাদ' নাটকে দিবাকর পার্কে পার্স খুঁজতে আসা মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করার জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। কেননা সে মনে করে ভালোবাসা না পেলে কোন পছন্দের মেয়ের দিকে হাঁটলে হাঁটাটা সহজ স্বাভাবিক হয় না। 'ভালোবাসা পেলেই না সহজ সুন্দর হাঁটা।' তাই নিজের অভাবটা বোঝাবার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করে সে নিজের কষ্টটা প্রকাশ করেন। কিন্তু বাইরে তার কোন কষ্ট নেই, আসল

কষ্ট হৃদয়ের।

নারীর প্রেমে গভীর আস্থা, প্রেমের এতটা গভীরবোধ, প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রেমের সুন্দর শিল্পসম্মত প্রকাশ, প্রেমের কাব্যিক নিবেদন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের নায়ক চরিত্রদের অ্যাবসার্ড আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নায়ক চরিত্রদের শৈশব মুখিনতা বা শৈশবের প্রতি একটা আকর্ষণ। সৌভিক রায়চৌধুরী বলেছেন, 'আসলে মোহিত সৃষ্ট এই পর্বের মোটামুটি সব চরিত্রেরই একই মৌলিক সমস্যা একধরনের অবদমিত regression (পশ্চাৎ/শৈশব-বাল্যমুখিনতা) তাদের আক্রান্ত করে রেখেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে ছেলেবেলার (কিংবা মেয়ে বেলার) যে নিষ্পাপ সারল্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ বিভাজন— তা আজও ব্যক্তিত্বে রয়ে গেছে। জটিল, দ্বন্দ্বময়, নিষ্করুণ পৃথিবীতে তারা তাই দিশেহারা হয়ে পড়ে। অশৈশব লালিত নৈতিকতার মাপকাঠি যে প্রতিবেশে অচল অবচেতনে সেটিকেই আঁকড়ে ধরতে চায় তারা। সেখানেই সংঘাত এবং তাই দর্শক পাঠকের মনে হয় এদের আচরণ উদ্ভট, উদ্বায়ুগ্রস্ত। এবং এভাবেই মোহিত প্রতিবাদ খাড়া করেন চারপাশের ছদ্ম নিয়ম-কানুন-আইন বিধিনিষেধের ঘোরাটোপের বিরুদ্ধে।'[১৮]

'মৃত্যুসংবাদ' নাটকে আগন্তুক লোকটির এই রকম শৈশবপ্রীতি লক্ষ করা যায়। লোকটি বুলুকে বলেন—

> ''লোকটি।। ... আমি যেমন একজন খুনী হতে পারি, তেমনি একটা ছোট্ট শিশুও হতে পারি। আপনাকে দেখে এখন আমার শক্ত হাত-পা বালকের মতো লাগছে। চোখে মুখে কৈশোরের নরম রোদ্দুর এসে পড়ছে, ঘাসফুলের উপর উড়ে বেড়ানো ফড়িংগুলো যেন আমাকে খেলায় ডাকছে। ..."[১৯]

ছোটবেলার চড়ুই পাখিটিকে তিনি ভুলতে পারেন না। বলেন —

> ''লোকটি ।। ... ছোটবেলায় একটা চড়ুই পাখিকে ধরে রঙ করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেটাকেও আর দেখিনি। দেখল ভালো লাগত। আমার এখন কিছু ভালো লাগে না যে! আমার মরে যাবার জন্য ঐ চড়ুইটিও দায়ী।"[২০]

'নিষাদ' নাটকে দিবাকরের ছোটবেলার হিরের আংটির কথা মনে পড়লে লতা দিবাকরকে বলে—

> 'লতা।। ... হিরেটা তোমার বন্ধু, ছোট বেলার বন্ধু। চারিদিকে যখন অন্ধকার ও তোমাকে আলো দেখায়। বলতে চায়, আমি আছি, আমাকে ভুলে যেও না।'[২১]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে অনেক চরিত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভীরু স্বভাবের। তাদের চরিত্রে সেরকম 'সাহস নেই, স্বভাবের সেরকম একটা দাপট নেই, কোন জোরালো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য' এসব কিছুই নেই। সাহসী হয়ে বীর হয়ে অল্পদিন বাঁচার চেয়ে তারা বরং ভীরু, কাপুরুষ হয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে চায়।

তাঁর প্রায় নাটকে একজন করে ডাক্তার চরিত্র দেখা যায়। বুদ্ধির দীপ্তিতে, তীক্ষ্ণ উইটের প্রকাশে, অদ্ভুত কথা ও চিকিৎসা পদ্ধতিতে ডাক্তার চরিত্রগুলো মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে বৈচিত্র্যের সংযোজন করেছে। কণ্ঠনালীতে সূর্য, গন্ধরাজের হাততালি, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, দ্বীপের রাজা, নিষাদ, রিঙ নাটকে ডাক্তার চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড ও দ্বীপের রাজা নাটকে ডাক্তারদের ভূমিকা প্রথাগত হলেও বাকি নাটকগুলিতে ডাক্তার চরিত্রদের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী নয়। নাটকের প্রধান চরিত্ররা যখন মানসিক বা আত্মগত নানা সমস্যায় জর্জরিত হয় ডাক্তাররা তখন অদ্ভুত উপায়ে তাদের চিকিৎসা করেন। রোগীদের সমস্যাও যেমন উদ্ভট ধরনের তেমনি ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতিও উদ্ভট ধরনের। তারা দার্শনিক সমস্যা, অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন মানুষদের ঔষুধ বা অস্ত্র প্রয়োগ করে চিকিৎসা করেন না, বরং দার্শনিক উপায়ে তাদের চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন। দুর্বোধ্য জটিল যুগ সংকটে জর্জরিত এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত চরিত্রদের নাট্যকার যেমন বাস্তব থেকে চ্যুত হয়ে ভিন্ন উপায়ে নির্মাণ করেছেন, তেমনি তাদের উদ্ধারের জন্য ডাক্তার চরিত্রগুলোকেও অনেকটা অবাস্তব উপায়ে সৃষ্টি করেছেন। ডাক্তারদের অবাস্তব চিকিৎসা পদ্ধতি নাটকে বুদ্ধি, কৌতুক এবং মজার আবেদন সৃষ্টি করেছে।

'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে আমরা মিলুর জ্যাঠামণি ডাক্তার লাহিড়ীকে পাই। অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির কণ্ঠে সূর্য আটকে যাওয়া রোগের কথা শুনে ডাক্তার লাহিড়ী অদ্ভুত রকমের চিকিৎসার কথা বলেন। তিনি নাকি এ ধরনের চিকিৎসা আগেও করেছেন। তার এক 'চিত্রশিল্পী বন্ধুর বুকের মধ্যে একটা মরা পাখি উড়তে উড়তে ঢুকেছিল।' তিনি লোকটির গলায় ছুরি না চালিয়েই চিকিৎসা করে সফল হয়েছিলেন। তাই তিনি আগন্তুক লোকটিরও কণ্ঠনালীর সূর্যটা বের করার কথা ভাবেন। এর জন্য তিনি এক ধরনের পাখির সন্ধান করবেন— পাখিটার শরীরের প্রায় সবটাই ঠোঁট, ছোট্ট একটুখানি মাত্র শরীর। এই পাখিটাই লোকটির ঠোঁটে বসে চঞ্চু ঢুকিয়ে সূর্যটা টেনে বের করবে। অবশ্য তার আগে সূর্যটায় একটা আংটা লাগিয়ে দেবে। তাহলে পাখিটার সূর্যটা ধরায় সুবিধা হবে। আর 'ভালোবাসা, দুঃখ কিংবা প্রাণখোলা হাসি থেকে যদি চোখে জেনুইন জল আসে' তবে তা দিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক ধরনের আঠা তৈরি করে তা দিয়ে আংটা বানানোর অদ্ভুত উপায়ের কথা ডাক্তার জানান। এমনই অদ্ভুত ডাক্তার লাহিড়ীর চিকিৎসা পদ্ধতি।

'গন্ধরাজের হাততালি' নাটকে হরিকিঙ্কর তলাপাত্র নিজেকে ডাক্তার বলে দাবি করেন। তবে তার চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'দার্শনিক চিকিৎসা, কমনসেন্স ট্রিটমেন্ট'। মীরার পায়ের কাছে হঠাৎ হঠাৎ অবশ হয়ে যাওয়া রোগের কথা শুনে হরিকিঙ্কর উদ্ভট ধরনের ট্রিটমেন্ট করার পরামর্শ দেন। এর জন্য তিনি প্রথমে মীরাকে ন্যাড়া হওয়ার পরামর্শ দিলেও পরে সেটা বাতিল করে, রোগীকে বেশি করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন। আর এই জন্য 'সকালে দুটো, বিকেলে একটা আর শোবার আগে দুটো ন্যাশনাল সঙ' গাওয়ার কথা বলেন মীরাকে। এইসব অদ্ভুত কথা শুনে মীরা তার কাছে জানতে চান, তিনি আজ পর্যন্ত কটা রোগী পেয়েছেন? হরিকিঙ্কর উত্তরে জানান, একজন। তবে তিনি

নাকি চিকিৎসার মাঝ পথেই পালিয়ে যান এবং তারপর থেকে তার আর কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। এছাড়া তিনি মীরাকে তার হাত-পাগুলো এক এক করে খুলে রাখতে বলেন। যাতে শরীর হালকা হলে নিজে থেকে ঘুম আসে। তিনি নিজেও ঘুমানোর সময় তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুলে রাখেন এবং হাত-পা-মাথা খুলে মীরাকে দেখানোরও চেষ্টা করেন।

'নিষাদ' নাটকে দিবাকরকে ডাক্তারের ভূমিকায় দেখা যায়। সেখানে তিনি দু'জন পেসেন্টের 'শর্ট সাইডেট' রোগ ও 'হৃদয় ছোট হয়ে যাওয়া রোগ' নির্ণয় করেন। প্রথম জন শর্ট সাইটেড কেননা তিনি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন অথচ দেখতে পাননি সিনেমা হলে কর্মচারীরা তখন ধর্মঘট করছিল। টিকিট কাটার সময় দূর থেকে ধর্মঘটী কর্মচারীরা তার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। যাতে টিকিট না কেটে তিনি কর্মচারীদের ধর্মঘটে সহযোগিতা করেন। অথচ তিনি তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে টিকিট কাটেন। ঠিক তখনই ধর্মঘটী কর্মচারীদের একটা বাচ্চার 'রুগন বুকে দম আটকে এল, বাঁচ্চাটা কেঁদে উঠল।' অথচ তিনি বাচ্চাটার মুখ দেখতে পাননি টিকিট কাটার সময়। তাই ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে জানান তার 'শর্ট সাইটেড' রোগ হয়েছে। আরো একজন রোগীকে পরীক্ষা করে দেখেন ডাক্তার। যেহেতু সেই রোগীটিও সিনেমা হলে ধর্মঘটের দিনে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন অথচ তিনিও ধর্মঘটী শ্রমিকদের আর্তনাদ শুনতে পাননি। তাদের সমর্থন করে রোগীটি কোন সহানুভূতি দেখাননি, তাই ডাক্তার বলেন, তার হৃদয় ছোট হয়ে আসছে। নাট্যকার এইভাবে অভিনব উপায়ে ডাক্তারি চিকিৎসার পেশা ও চিকিৎসা পদ্ধতিকে সমাজ-রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ ও প্রতিবাদের কাজে ব্যবহার করেছেন।

'রিং' নামক ছোট নাটকেও ডাক্তারের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যিনি অরুণ ও শীলার ছোট হয়ে যাওয়া রোগের চিকিৎসা করতে এসে বাগানে চোখের সামনে একটি নক্ষত্র ছিঁড়ে পড়তে দেখেন। তারপর সেই ছিঁড়ে পড়া নক্ষত্রটির পিছনে ছুটে তাকে ধরে পকেটে করে নিয়ে এসেছেন। ডাক্তার পরে জানান সেটা চরিত্রের দিক থেকে অনেকটা জোনাকির মতন। তার ধারণা আকাশে যত নক্ষত্র দেখা যায়— তার মধ্যে কিছু দৈত্যাকার জোনাকিও রয়েছে। ডাক্তার অরুণ-শীলাকে হিপ্‌নোটাইজ করে তাদের চিকিৎসা করেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের নারী চরিত্রগুলো মূলত পুরুষের সহযোগী। তবে কিছু নাটকে নারীদেরও নাটকের মূল কেন্দ্রে দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ চরিত্রে অবাস্তবতা আনলেও নারীদের তিনি বাস্তব রূপেই নির্মাণ করেছেন। নারী চরিত্ররা নায়কদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের দেখে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাথে দ্বন্দ্বও দেখা যায়। অনেক সময় নারীরা নায়কদের সাহচর্য দান করে, আবার বিরোধিতাও করে। নারী চরিত্রদের জন্যই নায়ক চরিত্ররা 'ভালোবাসার ভিখিরি'।

'মৃত্যুসংবাদ' নাটকের বুলু আগন্তুক লোকটির অস্তিত্বের কারণে বাবাকে হত্যার ঘটনার মধ্যে আলাদা অর্থ খুঁজে পায়। অস্তিত্বের যন্ত্রণার প্রতিশোধ হিসেবে লোকটির বাবাকে হত্যার ঘটনার মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকতা খুঁজে পায় সে। 'নীল রঙের ঘোড়া' নাটকে সোমনাথ তার এক সময়ের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে না পারলেও, পর্ণা ভালোবাসা দিয়ে বুঝতে পারে সোমনাথ অর্থের লোভে

রেসের মাঠে ঘোড়-দৌড় খেলতে খেলতে শেষ হয়ে যাচ্ছে, চুরি হয়ে যাচ্ছে, তার আত্মা তার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তার নিজের স্ত্রী মৃন্ময়ী সংসারের প্রয়োজনে, প্রচুর অর্থের লোভে বিপন্ন বিধ্বস্ত সোমনাথকে রেস্ খেলতে বাধ্য করে। অলৌকিক উপায়ে অর্থলাভের ফলে সোমনাথদের অবস্থা পরিবর্তনে তার মেয়ে মিনু একসময়ের ভালোবাসার মানুষ চঞ্চলকে ভুলে যায়। 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে শান্তা দিদিমনি সমাজ রাষ্ট্রের শত নিষেধ সত্ত্বেও প্রেতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন, প্রেতকে ভালোবাসার স্নেহস্পর্শে আবার মানব সমাজে ফিরিয়ে আনতে চান। প্রেতের সাথে মিলেমিশে চারপাশটা বদলে দিতে চান। শান্তার এক ধরনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে ভীত সন্ত্রস্ত প্রশাসন। দ্বীপের রাজা নাটকে রঙন হাইড্রোজেন বোমার রেডিয়েশন আক্রান্ত স্বামী সাগরের শরীর ছুঁয়ে নিজেও ভয়ঙ্কর রেডিয়েশন আক্রান্ত হয়ে সন্তানকে ছেড়ে, সবাইকে হারিয়ে নির্জন দ্বীপে স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকের রানিকে শাসনতন্ত্র তথা ক্ষমতাতন্ত্রের 'আকাঙ্ক্ষার রমণী মূর্তি' হিসেবে দেখা যায়। প্রবল ঝড়কে যিনি 'ক্রীতদাস' মনে করেন, যিনি 'ঘোড়া ছুটিয়ে চাবুক মেরে ঝড়টাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চান, যিনি আকাশটাকে শাসন করে, ঝড়টাকে বাড়িয়ে দিয়ে, গাছপালা ভাঙার শব্দে পাখিগুলো ঘুম ছেড়ে অসহায় উড়াল দিলে হাততালিতে দুর্গটাকে দুলিয়ে'[২২] দিতে চান। তার ইচ্ছা ছিল 'বিদ্যুতের আগুন দিয়ে কেউ' তাকে একটা আংটি বানিয়ে উপহার দিক, তাহলে কারিগরটাকে তিনি তার দুর্গটা উপহার দিতেন। নিষাদ নাটকে লতাকে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্ত্রী হিসেবে পাই। সে তার স্বামী দিবাকরকে বাইরের জগতের সমস্ত দায়িত্ব ভুলিয়ে সাংসারিক সুখে জোর করে বেঁধে রাখতে চায়। দুজনের সংসারটাকেই দিবাকরকে সমস্ত পৃথিবী হিসেবে ভাবতে বলে সে। সে জানে নিজেদের ছোট ঘরের চিন্তাতেই একদিন মাথার সমস্ত চুল পেকে যায়। নিজেদের সাজানো গোছানো মানানো সংসারের বাইরে সে দিবাকরকে বাইরের জগতের কোন সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা ভাবতে মানা করে। মানুষের কথা ভেবে দল পাকিয়ে আন্দোলন গণ্ডগোল করে মালিককে না খেপিয়ে বরং তার বশ্যতা স্বীকার করে 'নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে' সামিল হওয়ার পরামর্শ দেয় সে স্বামীকে।

'বাঘবন্দী' নাটকে দীপাকেও মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের স্ত্রী হিসেবে দেখি। সেও তার স্বামীর সঙ্গে 'সেইগাড্ডা', 'সেই ফুল তুলে মালা গাঁথা' আর 'সেই ওগো আর হ্যাঁগোর পুরনো ডুয়েটে' ডুবে থাকে সংসার সুখের আবহে। সন্তান স্নেহময়ী মা হিসেবেও সে বাঙালি মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের একজন নারী। সে স্বামীর সঙ্গে নিজেদের মাপে 'পৃথিবীটাকে ছেঁটে-ছুটে বড্ড ছোট্ট' করে নিয়েছে। আর নিজেদের সেই ছোট্ট পৃথিবীতে সন্তান লালন পালন করে ভবিষ্যৎ সুখের আশায়। আর সন্তানরা যখন বাইরের সমাজ-রাষ্ট্রের বৃহত্তর, মহত্তর, মানবিক ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে চায়, মায়েরা তখন তাদের স্নেহের আঁচলে বন্দী করে রাখার চেষ্টা করে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনেক নাটক যেহেতু নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত তাই তাঁর নাটকে বিপ্লবী চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। 'বাঘবন্দী' নাটকে রানার একসময়ের বন্ধু টুনু একজন বিপ্লবী সন্ত্রাসী চরিত্র। টুনু হঠাৎ রাতের বেলা রানাদের বাড়িতে এসে জানায় তাদের পরিচিত বিপুলকে

দেশের উন্মত্ত জনতার হাতে মরতে হয়েছে। সেও একজন বিপ্লবী ছিল। টুনু অনেকদিন পর রানাদের বাড়িতে এসে তাদের সুখের সংসার দেখে অবাক হয়ে যায়। তাদের ফুল মালা দিয়ে সাজানো গোছানো সংসারকে দেখে কটাক্ষ করে এবং রানার একসময়ের প্রতিবাদী সত্তাকে জাগানোর চেষ্টা করে। টুনু তাদের একটি ব্যাগ রাখতে দিয়ে চলে যায়। সেই ব্যাগে ছিল একটি বন্দুক। দু'জন নির্বিবাদী সংসারী মানুষকে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার একটি অস্ত্র দিয়ে যায় টুনু। চলে যাওয়ার পর আরও দু'জন যুবককে দেখা যায়, যারা বিপ্লবীদের প্রতিনিধি। রানা-দীপার সন্তান বিল্টুকে তারা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যেতে আসে। বিল্টুকে তার বাবা-মা ও রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থান্বেষী প্রতিষ্ঠান যেভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখে— যুবকেরা সেই ঘুমকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে বিল্টুকে জাগিয়ে দিয়ে নিজেদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তাকেও যুক্ত করাতে চায়। ক্যাপ্টেন হুর্‌রা নাটকেও চন্দ্রনাথ নামে একজন বিপ্লবী চরিত্রকে আমরা পাই। সে কয়লাখনির শ্রমিকদের মাঝে রাজনীতির কাজ করত। শ্রমিকদের প্রতিবাদী আন্দোলন পরিচালিত করায় তাকে রাষ্ট্রের পুলিশ গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখে। সে তার বন্ধু সুনীলকে চিঠিতে একটি ম্যাপের কথা বলেছিল। যেখানে নতুন দেশের কথা আছে। যে দেশে 'মাটি খুঁড়লে সোনা, হাত বাড়ালে বুকভরা বাতাস চোখ তুললে ঢেউ আর ঢেউ' পাওয়া যাবে। 'বাজপাখি' নাটকেও কেন্দ্রীয় চরিত্র কল্যাণের ছোট ভাই সুব্রত বিপ্লবী দলের পোস্টার এঁকে দেয়। কল্যাণ নিজে সাংসারিক মানুষ হলেও সবসময় তিনি দেশের রাজনীতির খবর রাখেন। রাজনীতির মোটা মোটা বই পড়েন। কোথায় যুদ্ধ লাগল, কোথায় গুলি চলল তার খবর রাখেন। হাজার হাজার মাইল দূরের প্রিয় নেতার সঙ্গে যিনি টেলিফোনে নিজের দেশের অবস্থা নিয়ে কথা বলতে চান। এইভাবে প্রবল, গভীর ও বাস্তব রাজনীতিবোধ বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনৈতিক সচেতনতা নাট্যকারের মধ্যবিত্ত নাগরিক চরিত্রগুলোকে একটা উন্নত ও মহত্তর মাত্রা দিয়েছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে রূপকথা বা উপকথার মতো বাস্তব ও ফ্যান্টাসি মেশানো যাদুকর চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো। প্রদীপ থেকে দৈত্য বেরিয়ে যেমন মালিকের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে। নাট্যকার এখানে অবাস্তব গল্প-কাহিনির ফর্মকে কাজে লাগিয়েছেন। যদিও নাট্যকারের নাটকে ম্যাজিসিয়ানের উপস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতীকী। নিষাদ নাটকে ম্যাজিসিয়ান ও তার প্রভুকে অবক্ষয়ী শোষণমূলক, বৈষম্যমূলক সমাজ-রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থান্বেষী প্রতিষ্ঠানের মালিকের প্রতীকে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকার। আবার রূপকথার গল্পে আমরা যেমন দেখেছি কোন অশুভ, অনিষ্টকারী দৈত্যের প্রাণ থাকে অন্য কোন বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে। এখানেও দেখি ম্যাজিসিয়ানের প্রাণ সোনার আপেলের মধ্যে থাকে। সোনার আপেল দু'ভাগ হলে তিনিও দু'ভাগ হয়ে যাবেন বলে ম্যাজিসিয়ান স্বয়ং জানান।

'নীল রঙের ঘোড়া' নাটকে রূপকথার মতো অলৌকিক নীল রঙের ঘোড়ার উপস্থিতি রয়েছে। সোমনাথ ছোটবেলায় এই ঘোড়ার স্বপ্ন দেখতেন। সেই ঘোড়াটা তাকে মাঝে মাঝে পা ফেলে তার কাছে ছুটে আসে—

''একটা সম্রাটের সিংহাসন পিঠে নিয়ে আমার সেই নীল রঙের ঘোড়াটা দেবদূতের মত

পা ফেলে ফেলে আসছে তলোয়ারের মত ঝকঝকে ঘাড়, গায়ে রোদ আয়নার মত ঠিকরোচ্ছে ... একটা সুন্দর অতিকায় ফুলের মত ভাসছে ঘোড়াটা। ..."[২৩]

নীল রঙের ঘোড়াটা সোমনাথকে নিয়ে যেতে চায়। এছাড়া এখানে রূপকথার মতো একজন শিশুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নাম নেই, পরিচয় নেই— অচেনা, অজানা রহস্যময় জায়গায় এসে যে সোমনাথকে একটা কাগজ দিয়ে যায় যেখানে পরের দিনের ঘোড়-রেসে জেতা ঘোড়াগুলোর নাম লেখা থাকে। 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে অবাস্তব প্রেত চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যে বাস্তব মানুষের হাত ধরে বাস্তব সমাজে ফিরে আসতে চায়। আর রাষ্ট্র সমস্ত শক্তি দিয়ে একজন প্রেতের বাস্তব সমাজে আগমন প্রতিহত করে।

তথ্যসূত্র:

১. 'হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই', কমল সাহা। প্রকাশ ৩১ মে ২০০৯। যুগ্ম প্রকাশক-বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ ও রঙ্গপট। কলকাতা। পৃ. ৪৫

২. 'নিরীহ সরলরেখার অন্তরালে'। কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুতপা সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা। অনুষ্টুপ। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। কলকাতা। পৃ. ১১। ৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৭. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৯। কলকাতা-১২, পৃ. ১০।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১২. মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। কলকাতা সম্পাদক- ডা. তপনজ্যোতি দাস। পৃ. ৮২

১৩. মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ২০০৩। প্রমা। অতিথি সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। কলকাতা, পৃ. ৯

১৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৫. মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। কলকাতা সম্পাদক- ডা. তপনজ্যোতি দাস। পৃ. ৩১৫

১৬. J.L STYAN/Mordern drama in theory and paractice /Expressionissm and Epic

Theatre/ Page.5/Cambridge University Press/Uk, 2000.

১৭. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা। পৃ. ৯৮।

১৮. অনুষ্টুপ। ১৪১১। পৃ. ১৭৫

১৯. মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, কলকাতা। পৃ. ৯৮।

২০. প্রগুক্ত। পৃ. ৯৮

২১. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০২

২২. প্রগুক্ত। পৃ. ২৫৬

২৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৬